বর্তিকা

মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজ, ইতিহাস বিভাগ
প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ।। জানুয়ারি ২০২৫

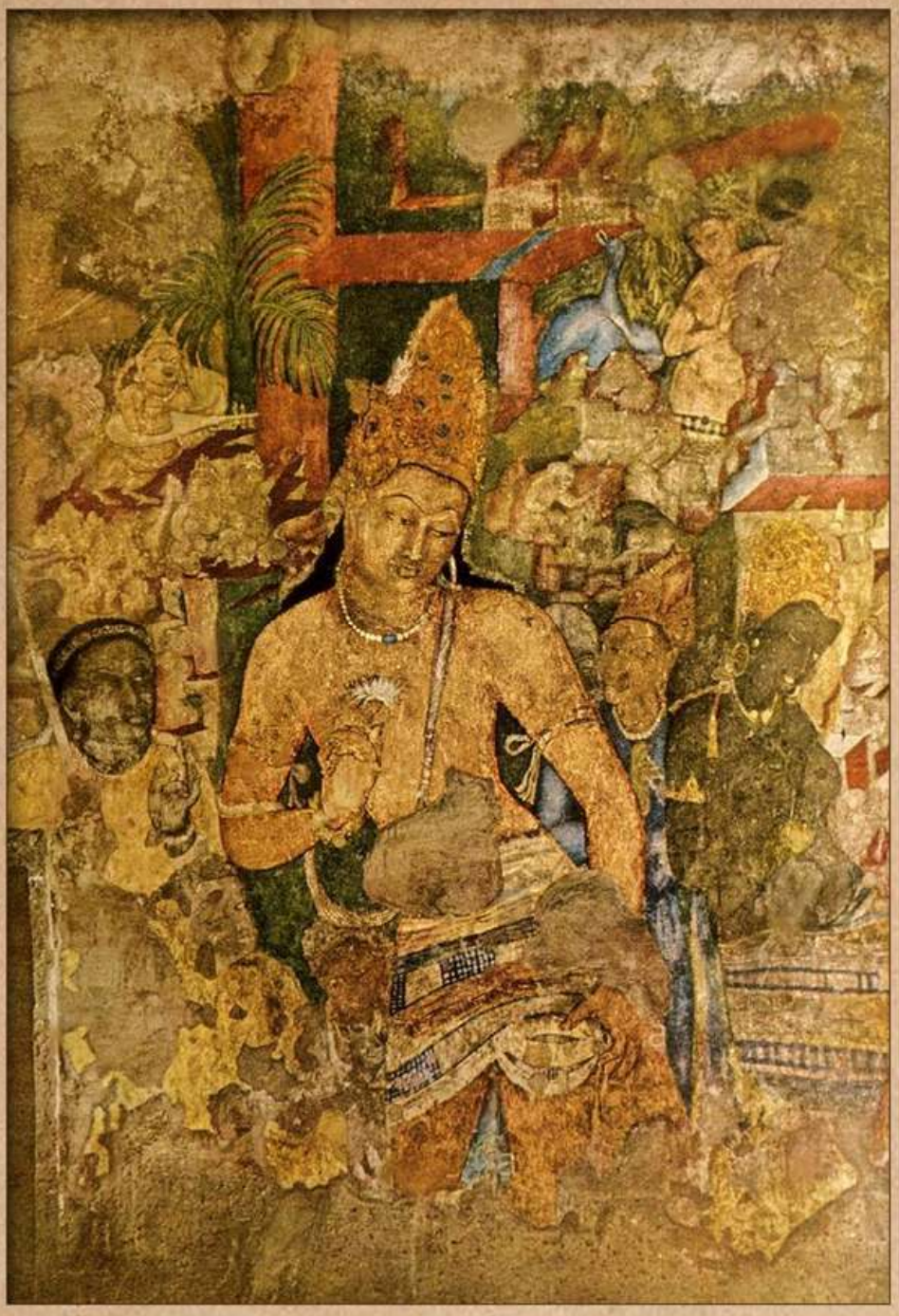

Bartika

Maharaja Manindra Chandra College, History Department

সম্পাদকের কলম

সম্পাদকের কলম

নতুন পাঠক্রম অনুসারে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব ভাবনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা নয়, সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে Skill Enhancement Course (SEC) পেপার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সিলেবাসে, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে। ইতিহাস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব ভাবনাকে ভাষায় প্রকাশের তাগিদেই এই ছোট্ট পত্রিকার জন্ম। তারা তাদের লেখা, ছবি দিয়ে এই পত্রিকাকে সাজিয়ে তুলেছে। সম্পাদক হিসেবে আমার দায়িত্ব শুধু সেই বিষয়গুলোকে এক সূত্রে বাঁধা। ২০২৫ সালে যে পত্রিকার পথ চলা শুরু হল আশা করব ধীরে ধীরে এই পত্রিকা সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকার সহযোগিতায় একদিন পরিণত হয়ে উঠবে।

বর্তিকা শব্দের আভিধানিক অর্থ আলো বা প্রদীপের সলতে, সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়েছে, আমার স্থির বিশ্বাস এই সলতে সবসময় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আলো জ্বালাতে সাহায্য করবে।

জানা-অজানা নালন্দা

জয়দীপ সুর
তৃতীয় সেমিস্টার (সাম্মানিক)

সর্বধর্মের মিলনক্ষেত্র আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। এই দেশের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের যেমন মনে করায় ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈদিক যুগে গুরুকূলের স্থান যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঠিক একইভাবে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ বিহারগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। তবে এইক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে প্রাচীন গুরুকূলে শিক্ষালাভের অধিকার ছিল ব্রাহ্মণ শ্রেণীর, অবশ্য পরে বাকি দুই শ্রেণী অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই অধিকার পায়। কিন্তু বৌদ্ধ বিহারগুলি ছিল উন্মুক্ত অর্থাৎ এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষালাভের অধিকার দেওয়া হতো। পূর্ব ভারতের বিহার রাজ্যের রাজগীর (পূর্বের নাম রাজগৃহ) শহরের নিকটবর্তী বা বলা চলে বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত নালন্দা মহাবিহার, এই নালন্দা মহাবিহারই সারা বিশ্বে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নামে বিখ্যাত যা কিনা ভারত তথা বিশ্বের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেক ঐতিহাসিক পৃথিবীর প্রথম অবৈতনিক, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আখ্যা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রাচীন ভারতীয় গুরুকূল শিক্ষা ব্যবস্থায় আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল একটি প্রাচীন বৈশিষ্ট্য, তবে এই শিক্ষা অবৈতনিক ছিল না কারণ শিক্ষা শেষে গুরু নিজ ইচ্ছানুসারে শিষ্যের থেকে গুরুদক্ষিণা দাবি করতেন এবং শিষ্যকে তা দিতে হতো। প্রাচীন ভারতের গুরুকূল শিক্ষার উল্লেখ আমরা আমাদের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে দেখতে পাই। মহাভারতে এটাও দেখতে পাই যে কৌরব ও পান্ডবদের অস্ত্র ও শাস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্য শিক্ষা শেষে তাঁর শিষ্যদের কাছে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের পরাজয় ও তাঁর রাজ্য দাবি করেন। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুদক্ষিণা প্রথা ছিল না। এই কারণে নালন্দা ছিল অবৈতনিক।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নানা কারণে সারা বিশ্বে প্রশংসিত হলেও মূলত প্রশংসা পেয়েছে তার সুবৃহৎ এবং সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের জন্য। শোনা যায় এই গ্রন্থাগারে সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা পুঁথি ও প্রাচীন পান্ডুলিপি ছিল। এই গ্রন্থাগারের বিষয়ে আলোচনার পূর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। পুরাকালে নালন্দা ছিল এক সমৃদ্ধ গ্রাম। বৌদ্ধদের কাছে, এই গ্রাম ছিল এক পূর্ণ ভূমি। ভগবান বুদ্ধের পাদধূলায় এই ভূমি পুষ্ট। হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন যে, পঞ্চশত (৫০০) বণিক দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে এই গ্রামটি ক্রয় করেন এবং শ্রদ্ধাপূর্বক তা অর্পণ করেন তথাগত বুদ্ধের কাছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ কুন-দগা-স্নিং-পো, যিনি তারানাথ নামে খ্যাত, তাঁর রচনা (Gya-gar-chos-byun)-তে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের দশ প্রিয় শিষ্যের অন্যতম সারিপুত্র নালন্দার উপকণ্ঠেই জন্মেছিলেন। মহাসুদর্শন-জাতক-এ উল্লেখ আছে যে "তথাগত যখন জেতবনে ছিলেন তখন নাল-গ্রাম-জাত-স্থবির সারিপুত্র কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন বরক নামক স্থানে পরিনির্বাণ লাভ করেন।"

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে, সম্রাট অশোক নালন্দাতে, সারিপুত্রের সমাধিভূমি পূজা করে, তথাগতের স্মৃতিকল্পে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাই অতীতের সময় থেকেই বৌদ্ধদের কাছে, নালন্দা দেবভূমি সম পবিত্র ছিল। এখনও তা বর্তমান।

ফা-হিয়ান ভারতে আসেন, খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে। কিন্তু তাঁর রচনায়, নালন্দা মহাবিহারের উল্লেখ নেই। সম্ভবত হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন ৬৩০ খিষ্টাব্দে। তাঁর রচনাতে নালন্দা মহাবিহারের বিশদ উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক মতে, এই দুই চীনা পরিব্রাজকের মধ্যবর্তীকালে, নালন্দা মহাবিহারের সূত্রপাত হয়। জেনারেল কানিংহাম মনে করেন যে, ৪২৫-৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে, নালন্দা মহাবিহার তৈরি হয়। ১৯২৭-১৯২৮ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যের ফলে, নালন্দার প্রত্নক্ষেত্র থেকে, একটি তাম্রলিপি আবিষ্কার হয়। 'Annual Report, Archaeological Survey of India 1927-28'-এর ১৩৮ পৃষ্ঠায় এই তাম্রলিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে গুপ্ত বংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্ত ও তদীয় পুত্র বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। তাই মনে রাখতে হবে যে, চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দে, নালন্দা মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নালন্দা বিহার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠা ছিল এক দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

হিউয়েন সাঙ-এর মতে গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকগণ এই মতকে সমর্থন করেন। এমনকি নালন্দা থেকে একটি শীল আবিষ্কৃত হয়েছে যা হিউয়েন সাঙের মতের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

তথাগত বুদ্ধের সময় থেকেই, নালন্দা অঞ্চল বৌদ্ধদের তীর্থভূমি হয়ে ওঠে। হিউয়েন সাঙের মতে, নালন্দার রাজা বালাদিত্য, এই বিহারে উত্তর-পূর্ব দিকে যে স্তূপটি তৈরি করেন, অতীতে তথাগত সেখানে বসেই ধর্মাদেশ দিতেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এই স্থানে বৌদ্ধরা জ্ঞানচর্চা করতেন। Hartmut Scharef নিজ গ্রন্থ 'Education in Acent India' (পৃঃ ১৫৯) উল্লেখ করেছেন যে, তিব্বতী সাহিত্য মতে, নালন্দার গ্রন্থাগারকে বলা হতো 'ধর্মগঞ্জ'। এখানে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ জ্ঞান। আর 'গঞ্জ' শব্দের অর্থ হল বাজার। তাহলে 'ধর্মগঞ্জ' শব্দের অর্থ হল, জ্ঞানের বাজার।

বাজার বা হাটে, নানান স্থান থেকে দ্রব্যাদি আসে। এক স্থানে তা জমা হয়। গ্রাহক নানান বর্ণের, চরিত্রের নানান স্থানের দ্রব্যকে একসাথে পায়। নালন্দার এই 'ধর্মগঞ্জ' শব্দের ব্যবহার, সম্ভবত এই অর্থেই ব্যবহৃত হতো। নানান স্থানের, নানান বিষয়ের জ্ঞান বা তথ্য এখানে জমা হতো এবং তা ভোগ করত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠককূল। সেই অর্থে এটি ছিল সার্থক নাম। এই 'ধর্মগঞ্জ' বা গ্রন্থাগার ছিল তিনটি বহুতল ভবনের সমষ্টি। এই ভবন ত্রয়ের পৃথক পৃথক নামগুলি হলো যথাক্রমে 'রত্নসাগর', 'রত্নদধি', 'রত্নরঞ্জক'। এর মধ্যে রত্নদধি ছিল নয়তল বিশিষ্ট, বাকি দুটি ভবন ছিল ছয় তল বিশিষ্ট। নালন্দার প্রত্নক্ষেত্র প্রমাণ দেয় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় বহুতল ভবনের সমষ্টি ছিল। তাই, এই বহুতল তিন ভবন যে তখন বাস্তবে অবস্থিত ছিল, তা পন্ডিত মহল স্বীকার করেন।

এই তিনটি ভবনে লক্ষাধিক পুঁথি সংরক্ষিত ছিল, তবে এই ভবন ত্রয়ের মধ্যে রত্নদধি ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ভবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি সজ্জিত ও সংরক্ষিত থাকত। 'গুহ্যসমাজ', 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' প্রভৃতি এমন অনেক গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল 'রত্নদধি' ভবনে। 'রত্নদধি' ভবনের গুরুত্ব দেখে মনে করা যেতে পারে অতীতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছিল। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে অবাক লাগে যে, আজ থেকে এতো বছর আগে, এতো বৃহৎ আকৃতির গ্রন্থাগার ভারতে গড়ে উঠেছিল। এই গ্রন্থাগারগুলির সংস্কার হতো। 'Taxila Glow, But Nalanda in Shadow' প্রবন্ধে Jayant V. Narlikar উল্লেখ করেছেন যে, মুদ্রিত ভদ্র নামক এক শাসক একদা এই গ্রন্থাগারের সংস্কার করেছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে ভারত ও তার পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন - তিব্বত, চিন, কোরিয়া, জাপান, সিংহল, জাভা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি থেকে শিক্ষার্থীরা আসত শিক্ষালাভের আশা নিয়ে, তবে সকলের সে আশা পূরণ হতো না কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হতো। এই প্রবেশিকা পরীক্ষা মোট তিনটি পর্যায়ে হতো, প্রথম পরীক্ষা নিতো বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারপাল । হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেন যে মাত্র কুড়ি শতাংশ পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হতো। ভর্তির বয়স নির্দিষ্ট ছিল কুড়ি বছর। আভ্যন্তরীণভাবে নিয়মিত ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল যা আজকের মাধ্যমিক পরীক্ষার মতো, তাদের ক্ষেত্রে আলাদা করে কোনো প্রবেশিকা পরীক্ষার আয়োজন করা হতো না।

ইৎ-শিঙের মতে মঠের জীবনযাত্রা কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকলেও ঘর ভাগ করা থেকে শুরু করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হতো। নালন্দার বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সংহতি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছিলেন যে, সাত শতক ধরে এই সংহতিতে একটি ঘটনাও নথিভুক্ত নেই, যেটি অপরাধমূলক কাজের দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে। সংঘ চেতনা ব্যক্তি-সন্ন্যাসীদের থেকে বেশি গুরুত্ব পেতো। নালন্দার সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তবে তাঁরা নিজেদের মধ্যেকার সংহতিকে কোনওভাবেই বিপন্ন হতে দিতেন না। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আদর্শগত মতপার্থক্যকে বিতর্ক ও আলোচনার সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও অধ্যাপক সকলকেই শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে হতো। শুধু যে শয্যাগ্রহণ ও শয্যাত্যাগের নির্দিষ্ট সময় ছিল তাই নয়, এর মধ্যবর্তী সময়ে কখন কি করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে তাও সুনির্দিষ্ট ছিল। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সমাজগত অবস্থানের কোনো প্রভাব ছিল না। রাজপুত্র এবং সাধারণ পরিবারের সন্তান, সকলকেই শৃঙ্খলা মেনে চলতে হতো।

বর্তমানে বিশ্বের সব গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। অতীতের নালন্দা গ্রন্থাগারে, এই অনুবাদ পরিষেবা বজায় ছিল। নালন্দার বহু পন্ডিত বিদেশে যান, রাজ আমন্ত্রণে। তাদের একাংশ বিদেশেই থেকে যান, কিছু পন্ডিত আবার নালন্দায় ফিরেও আসেন। তিব্বতের রাজা ত্রিস্রোং দেনসেন একদা অনুরোধ জানান কমলশীলকে নিজ দেশে আগমনের জন্য, এবং তিনি সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে তিব্বত যাত্রা করেন।

অতীশ দীপঙ্কর (৯৮২-১০৫৪) মাত্র বারো বছর বয়সে নালন্দায় ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি ওদন্তপুরী গিয়ে শীলরক্ষিতের কাছে উপসম্পাদ বিষয়ে পাঠ নেন। শেষে নালন্দা মহাবিহারের শিক্ষক পদ লাভ করেন। পরে কিছুকাল বিক্রমশীলায় তিনি শিক্ষকতা করে তিব্বতের রাজার আহ্বানে ১০৪৪ সালে তিনি নেপাল হয়ে তিব্বতে আসেন। এখানে রচনা করেন 'বোধিপথপ্রদীপ'।

ইৎ-শিঙ ৪০০ পুঁথি নিজ দেশে নিয়ে যান। যার একটি বড় অংশ তিনি সংগ্রহ করেন নালন্দার গ্রন্থাগার থেকে। হিউয়েন সাঙের সংগ্রহ ছিল আরও বেশি।

কথিত আছে তাঁর সংগৃহীত পুঁথি ও অন্যান্য দ্রব্য চিনে নিয়ে যেতে, ২০টি ঘোড়ার দরকার পড়ে। তবে সিন্ধু নদী পার করতে গিয়ে, অনেক পুঁথি নদীর জলে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

নানান সময়ে নালন্দার পন্ডিতগণ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পন্ডিতগণও নালন্দায় আসতেন, এইভাবে জ্ঞানের আদানপ্রদান চলত। এই গ্রন্থাগার পরিষেবার ইতিকথা, যথেষ্ট আধুনিকতার দাবি রাখে। তবে ৭০০ বছর যাবত জ্ঞানচর্চার পর, এই বিশ্ববিদ্যালয় ও তার গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়।

৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে হুন সেনাপতি মিহিরকুল নালন্দা আক্রমণ করেন। এই মহাবিহারের সম্ভবত, এটিই ছিল প্রথম আক্রমণ। কথিত আছে যে মিহিরকুল নরমুণ্ড নিয়ে খেলতে ও নররক্ত দিয়ে স্নান করতে ভালোবাসতেন। তিনি একদা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাঁর নিষ্ঠুর প্রকৃতির কথা জানতে পেরে তাকে বৌদ্ধ ধর্ম দানে অস্বীকার করেন ফলে তিনি চরম বৌদ্ধবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। ধ্বংস করেন প্রচুর বৌদ্ধ মঠ। সম্ভবত নরসিংহ গুপ্তের সৈন্যবাহিনীর চাপে পড়ে, হুণ সেনাদের নালন্দা ও সম্পূর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে বিতাড়িত হতে হয়।

মিহিরকুল-এর আক্রমণের প্রায় ২৫০ বছর পর নালন্দা আক্রান্ত হয় এক দেশীয় শক্তির দ্বারা। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক। তিনি ছিলেন শৈব অর্থাৎ ভগবান শিবের উপাসক। তবে তিনি নালন্দা আক্রমণ করেন মগধেশ্বর হর্ষবর্ধনের কারণে। তবে বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ ছেদন, বুদ্ধগয়া থেকে বুদ্ধমূর্তি অপসারণ, বুদ্ধ পদচিহ্ন গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ সর্বোপরি নালন্দা মহাবিহার আক্রমণ সম্রাট শশাঙ্ককে বৌদ্ধ বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করে। উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের ক্ষমতা দখলের লড়াই চলে যা পরবর্তীতে ধর্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। বৌদ্ধরা হর্ষবর্ধনের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠার ফলে ব্রাহ্মণদের নিজের দিকে আনতে শশাঙ্ক হয়ে ওঠেন বৌদ্ধ বিদ্বেষী। তিনি নালন্দা আক্রমণ করেন কারণ তৎকালীন সময়ে নালন্দার মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা হর্ষবর্ধন।

নালন্দার ধ্বংসের কথা এলেই, আগেই বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের কথা বলা হয়। তবে এই একটি আক্রমণই, নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংস করেছিল, তা সঠিক নয়। এই বিহার ধ্বংসের একাধিক কারণ ছিল। ঐতিহাসিক ভিত্তি থেকে জানা যায় একবার নয় বরং চারবার আক্রমণ করা হয়েছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও ছিল আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়, যা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিত্তি নষ্ট করে দিয়েছিল। নালন্দা ধ্বংসের জন্য যে কয়েকটি কারণ পাওয়া যায় তা পর্যায়ক্রমিক আকারে সাজালে যা দাঁড়ায় তা হলো -

১) উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধ বিদ্বেষ
২) বৌদ্ধ ধর্মের আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়
৩) দেশীয় রাজাদের অন্তঃকলহ
৪) দেশীয় ও বৈদেশিক রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার অভাব
৫) দেশীয় ও বৈদেশিক রাজশক্তির আক্রমণ

এই পাঁচটি বিশেষ কারণ ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পিছনে। তবে অন্যান্য সকল কারণের থেকে সর্বশেষ কারণ অর্থাৎ দেশীয় ও বৈদেশিক রাজশক্তির আক্রমণকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

নালন্দার সর্ববৃহৎ ও ভয়ঙ্কর আক্রমণের ধ্বংসলীলার নায়ক হলেন বখতিয়ার খিলজি। ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর তুর্কি আফগান শাসক প্রধান কুতুবউদ্দিনের সেনাপতি ছিলেন বখতিয়ার খিলজি। তাঁর চালানো ধ্বংসলীলার প্রভাবেই ধ্বংসের মুখে পড়ে নালন্দা ও তার সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। ইরানীয় ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দিনের লেখা বই, 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে এই অমানবিক ও নিষ্ঠুর ধ্বংসের ইতিকথার বর্ণনা আছে।

বখতিয়ার খিলজি খুবই নিষ্ঠুর ছিলেন। মূলত বৌদ্ধবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল। শুধু নালন্দা নয়, উদান্তপুরী, বিক্রমপুর সহ বহু বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও তার গ্রন্থাগার বখতিয়ার খিলজি ধ্বংস করেন।

কথিত আছে যে, একদা বখতিয়ার খিলজি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর হাকিম বাহিনী এ রোগের চিকিৎসায় অক্ষমতার পরিচয় দেন। সে সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন শ্রীভদ্র। শ্রীভদ্রকে খিলজি আহ্বান করেন এবং শর্ত দেন যে কোনোরূপ ওষুধ না খাইয়ে তাঁকে সুস্থ করতে হবে। শ্রীভদ্র ছলনার আশ্রয় নিয়ে কোরানের পাতায় ওষুধ লেপন করেন এবং তা খিলজির হাতে দেন প্রতিদিন পড়ার জন্য। খিলজি সম্ভবত পুস্তকের পৃষ্ঠা পরিবর্তনে নিজ মুখনিঃসৃত লালা ব্যবহার করতেন ফলে শ্রীভদ্রের ওষুধ তাঁর শরীরে প্রবেশ করে এবং তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু খিলজি বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে তাঁর হাকিমদের পরাজয় মেনে নিতে পারেননি। একপ্রকার ঈর্ষা থেকেই তিনি আক্রমণ করেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ধ্বংস করেন 'জ্ঞানগঞ্জ'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে তিনি অগ্নিসংযোগ করেন যা জ্বলেছিল প্রায় ছয় মাস যাবৎ। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় এক বিশাল ধ্বংসস্তূপে।

এই ধ্বংসলীলার প্রায় ৪০ বছর পর অর্থাৎ ১২৩৪-১২৩৬ অব্দে ভারতে আসেন তিব্বতীয় পর্যটক ধর্মস্বামী। তাঁর রচনা থেকে জানা যায় সেই সময়ে নালন্দায় মাত্র দুটি মঠ ছিল এবং ছাত্র সংখ্যা মাত্র ৭০ জন। এই সময়ে ওদন্তপুরা সৈন্য ছাউনি থেকে নালন্দা আক্রমণ করে, এবং পুরোপুরি ধ্বংস হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়। ধর্মস্বামীর লেখা থেকে নালন্দার গ্রন্থাগারের কোনো উল্লেখ মেলে না তাই ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে খিলজির আক্রমণের পর আর গ্রন্থাগারের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

এইভাবেই অতীতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়। নালন্দা মহাবিহার শুধু ভারতীয় শিক্ষা বা গ্রন্থাগারের ইতিকথা নয়, অতীতের ভারতের এক গৌরবময় অধ্যায়। ৭০০ থেকে ৮০০ বছরের স্থায়ী ইতিহাস, আজ প্রত্নক্ষেত্রের ধ্বংসস্তূপ। আর এর স্মৃতি শুধু কিছু পুরাতন সাহিত্যে বর্তমান। তবে আশা রাখা যায়, অতীতের এই ইতিহাসের কথা জানা যাবে ভবিষ্যতের আরও গবেষণায়।

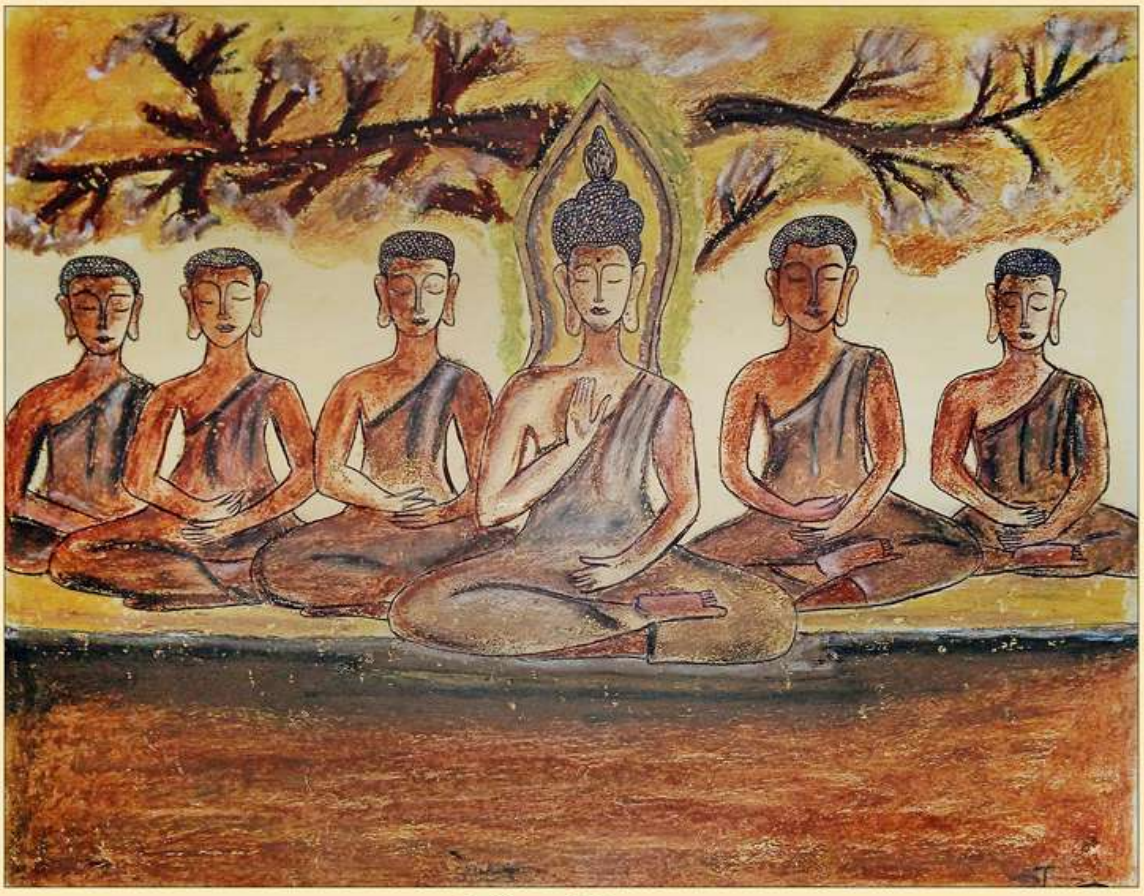

শিল্পীঃ অরিত্রি ঘোষ

প্রথম সেমিস্টার (সাম্মানিক)

নালন্দা মহাবিহার

দিয়া সিংহ বিস্ত
প্রথম সেমিস্টার (সাম্মানিক)

নালন্দা নামটি প্রাচীন বৌদ্ধ মহাবিহারের একটি চিত্র তুলে ধরে, যা খ্রিষ্টীয় ৫ থেকে ১২ শতকের মধ্যে প্রায় ৭০০ বছর ধরে বৌদ্ধ শিক্ষার একটি বড়ো আসন ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষার বিকাশে নালন্দা মহাবিহার ছিল অন্যতম, নালন্দার অবদান ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। নালন্দার অনেক মহান আচার্যদের বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রসারে সহায়তা করেছিল। প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বিখ্যাত ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ও প্রাচীন শিক্ষা কেন্দ্রটি হল 'নালন্দা মহাবিহার'।

গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-র পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বর্তমানে বিহারের রাজধানী পাটনার অদূরে এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আবসিক।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ ছিল অবৈতনিক, শিক্ষাদানের জন্য এখানে ১০০টি কক্ষ ছিল, সেখানে ছাত্রদের পড়ার ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর, স্নানের ঘর এবং বিশাল গ্রন্থাগারের সু-বন্দোবস্ত ছিল।

সর্বোপরি এখানে ছিল শিক্ষাগ্রহণের মনোরম পরিবেশ। ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বহুতল অট্টালিকা, ফুলের বাগান, দীঘি ইত্যাদি। মহাবিহার নালন্দার অনেক অংশে আজ পর্যন্ত বহু খননকার্য চালানো হয়েছে।

নালন্দার আয়তন শুধুমাত্র দৈর্ঘ্যে ১,৬০০ ফুট প্রস্থে ৮০০ ফুট বা প্রায় ১২ একর। নালন্দা পৃথিবীর প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি এবং এটি ইতিহাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি ভিন্ন ভিন্ন চত্বর এবং দশটি মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এখানকার পাঠাগারটি ছিল নয়তলা বিশিষ্ট ভবন। যেখানে পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হতো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১০,০০০ ছাত্র পড়াশোনা করত এবং এই ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য ১,৫০০ জন শিক্ষকের দায়িত্ব ছিল। শিক্ষকরা সকলেই ছিলেন আবাসিক সন্ন্যাসী। ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্য সু-সম্পর্ক ছিল দেখার মতো। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্র তিনি পাঁচ বছর এখানে পড়াশোনা করেছিলেন এবং পরে তিনি এখানকার আচার্য হয়েছিলেন। নালন্দার জগতজোড়া খ্যাতির নেপথ্যে মূল অবদান বহন করেছিলেন নালন্দার শিক্ষকরা, তাঁদের ব্যবহার ও কথাবার্তা ছিল অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র এবং তাঁদের নিয়মকানুন ছিল যথেষ্ট কঠোর। প্রাচীনকালের বিখ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্র ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা শিক্ষাগ্রহণ করতে আসত এবং তারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ দর্শন, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হতো। নালন্দা মহাবিহারে শিক্ষার্থীর কাছ হতে কোনো প্রকার অর্থ বা বেতন গ্রহণ করা হতো না। এখানে থাকা-খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদও বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হতো।

বহু বহু বছর ধরে অবদান রেখে আসা একটি সভ্য, উন্নত জাতি তৈরিতে জ্ঞান উৎপাদনকারী নিরীহ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়াউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর আক্রমণে হাজার হাজার হিন্দু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আগুনে পুড়িয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রচারের চেষ্টা করেন খিলজি। এরপর আগুন লাগিয়ে দেন লাইব্রেরী ভবনগুলিতে। লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা এত পরিমাণ ছিল যে মাস কয়েক সময় লেগেছিল এই মূল্যবান বইগুলি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে ছাই হতে। তিনি শুধু নালন্দাকেই পুড়িয়ে ছাই করেননি তিনি জাতির সভ্যতা, ইতিহাস ও জ্ঞানকেও ধ্বংস করেছিলেন।

অশোক - ভেরীঘোষ থেকে ধম্মঘোষ

সা নি য়া সে ন
তৃতীয় সেমিস্টার (সাম্মানিক)

ধৌলি

অশোকের নামের সাথে যুক্ত হয়ে আছে ভয়াবহ কলিঙ্গ যুদ্ধের স্মৃতি, যেখানে প্রায় এক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। এই কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোকের জীবন ও তাঁর শাসননীতিতে পরিবর্তন আসে। এছাড়াও আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ ও তার প্রচার করা। অশোকের জীবনকাহিনী, কলিঙ্গ যুদ্ধ, অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ ও তার প্রচার সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। এর মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য উপাদান হল কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ও মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' আর অশোকের শিলালেখগুলি - যার বিশ্বাসযোগ্যতা ঐতিহাসিকদের কাছে অনেক বেশি। ১৮৩৭ সালে কলকাতা টাঁকশালের কর্মচারী এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে যুক্ত জেমস প্রিন্সেপ প্রথম অশোকের শিলালেখগুলি পাঠোদ্ধার করেন। ভারতের ইতিহাসে অশোকই প্রথম যিনি তাঁর আদর্শ ও কৃতিত্ব লিপিবদ্ধ করেন। অশোক তাঁর শিলালেখগুলিতে নামের বদলে *'দেবানাং পিয়'* কথাটি ব্যবহার করেন। অশোকের শিলালেখগুলি যে সমস্ত স্থানে পাওয়া যায় তা হল পেশোয়ারের অন্তর্গত শাহবাজগাড়ি, ওড়িশার পুরী জেলার ধৌলি, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত সোপারা প্রভৃতি স্থানে।

খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হয় এবং এর চার বছর পরে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয় খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে। কিন্তু এই চার বছরের ব্যবধান কেন? এই কালগত ব্যবধানের ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকরা খুঁজেছেন বৌদ্ধসাহিত্যে, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে অশোক রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃবিরোধের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করলেন, এইজন্য বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁকে 'চন্ডাশোক' বলা হয়েছে। অশোক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন এর কোন সহায়ক তথ্য নেই, সিংহলী ইতিবৃত্ত ছাড়া অন্য কোনো ঐতিহাসিক উপাদানে এর সমর্থন পাওয়া যায় না। অশোকের রাজত্বকালে রাজনৈতিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাঁর কলিঙ্গ জয়। কলিঙ্গ জয় অশোকের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়েছিল কেন? ঐতিহাসিক ড. ভান্ডারকরের মতে কলিঙ্গের দক্ষিণে অন্ধ্ররাজ্য বিন্দুসার জয় করেছিলেন। এর ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের একদিকে ছিল চোল, অন্যদিকে ছিল কলিঙ্গ রাজ্য। চোল এবং কলিঙ্গ দুই-ই ছিল কলিঙ্গের শত্রু, হিন্দু রাষ্ট্রনীতি অনুসারে তারা পরস্পরের মিত্র ছিল। এইজন্য অশোকের পক্ষে কলিঙ্গ জয় ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিব্বতের বিবরণ অনুযায়ী অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভ করে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশের স্থলপথ ও সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন।

অশোকের পক্ষে কলিঙ্গ জয় করা সহজ ছিল না। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যাবে অশোকের ত্রয়োদশ গিরি অনুশাসনে। অনুশাসন অনুযায়ী অশোক তাঁর অভিষেকের পর অষ্টম বর্ষ অতিক্রম হলে কলিঙ্গ জয় করে। এই যুদ্ধে শতসহস্র প্রাণ অপবাহিত হয়, নিহত হয় আরও শতসহস্র মানুষের প্রাণ। কিন্তু ভয়াবহ হিংসার মাধ্যমে কলিঙ্গ জয় করার পর অশোকের গভীর অনুশোচনা হয়। এই ব্যাপক প্রাণ সংহার ও ক্লেশ দর্শন করার পর অশোকের তীব্র অনুশোচনার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অশোক কর্তৃক আগ্রাসী যুদ্ধের নীতি পাকাপাকিভাবে পরিত্যক্ত হয়। সেই বিম্বিসারের আমল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২৬১ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে জঙ্গি আগ্রাসী নীতির প্রয়োগ করে মগধ দক্ষিণ বিহারের একটি মহাজনপদ থেকে সর্বভারতীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। অশোক তীব্র অনুশোচনার ফলে যুদ্ধ ত্যাগ করলেও কলিঙ্গের ওপর কর্তৃত্ব ত্যাগ করেননি বরং তাকে প্রশাসনিক রাজনৈতিক প্রাধান্যর অধীনে রেখেছিলেন। অশোক বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা নিয়ে শান্তির পূজারী রূপে মানুষের মনে প্রেম জাগিয়ে তোলেন। তবে ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার মনে করেন কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলে অশোক কখনই সম্পূর্ণ শান্তিবাদীতে পরিণত হয়ে ওঠেননি। কারণ তাহলে তিনি যুদ্ধবন্দীদের ক্ষমা করতেন, কলিঙ্গকে মুক্ত করে দিতেন, নিজ সেনা ভেঙে দিতেন আসলে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে নিরাপদে রাখার জন্য তখন শান্তির বাণী প্রচার করেন। তাহলে সত্যিই কি অশোকের অনুশোচনা নিতান্তই এক নাটক ছিল তাঁর বৃহৎ সাম্রাজ্যকে নিরাপদে রাখার জন্য? এই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

আমরা আগে থেকেই দেখে এসেছি অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে যুদ্ধ ত্যাগ করেন। কিন্তু আসলেই কি অশোকের ধর্মনীতি এবং বৌদ্ধ ধর্মনীতি একই ছিল? অশোক তাঁর শিলালেখগুলিতে 'ধর্ম'-এর বদলে 'ধম্ম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা বৌদ্ধ ধর্মে পাওয়া যায় না। অশোক প্রথমে শিবের উপাসক ছিলেন কিন্তু পরে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রাজ্যাভিষেকের দশম বছর অতিক্রান্ত হলে অশোক 'সক্রিয় বৌদ্ধ' হিসেবে সম্বোধিত হন। বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রামেও যে তিনি পরিদর্শনে যান তার স্পষ্ট স্বাক্ষ্য বহন করে তাঁর রুমিনিদেই লেখ। অশোক তাঁর ধর্মযাত্রায় ২৫৬ রজনী পরিভ্রমণ করেন। বৌদ্ধ সংঘের বিভেদজনিত ভাঙ্গন রোধ করতেও তাঁর প্রয়াস লিপিবদ্ধ হয়েছে সাঁচী ও সারনাথে খোদিত দুটি গৌণ স্তম্ভের অনুশাসনে। কিন্তু বিস্মিত হওয়ার মতো ঘটনা এই যে অশোকের অনুশাসনে ধম্ম সংক্রান্ত আলোচনায় নির্দেশাবলীতে কখনওই উচ্চারিত হয় না বৌদ্ধ ধর্মের কয়েকটি মুখ্য বিষয়।

যেমন 'চতুরাবর্গত্য' অশোকের অনুশাসনে একেবারেই নীরব। অশোক কি প্রকৃতই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন। প্রাকৃত লেখতে অশোক যাকে ধম্ম বলেছেন তা আরবীয় ও গ্রিক অনুশাসনে কখনও ধর্ম বলে অনূদিত হয় না। ধম্ম অনুশীলনের জন্য অশোক কয়েকটি শিষ্টাচার চর্চা করার উপদেশ দিয়েছেন যেমন পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা, কল্যাণধর্মী কাজ করা, হিংসা, ক্রোধ নিষ্ঠুরতা পরিহার করা, পিতা মাতা ও গুরুর প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণ করা, দাস ভৃত্য প্রত্যেকের প্রতি যথাবিহিত আচরণ করা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির সাথে বৌদ্ধ ধর্মের কোনো মিল পাওয়া যায় না।

অশোকের বক্তব্য অনুসারে এই নিয়ম পালন করলে মানুষ স্বর্গলাভ করবে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে স্বর্গলাভের কথা সেইভাবে উচ্চারিত করা হয়নি। ঐতিহাসিকদের মতে অশোক নিজে থেকে এই নিয়মগুলি তৈরি করেছিলেন যাতে মানুষ শান্তিবাদী হয়ে থেকে যুদ্ধ বা বিদ্রোহের পথে পা না বাড়ায় এবং এর দ্বারা যাতে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য সুরক্ষিত থাকে। অশোক নিজে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর ধম্মনীতি বৌদ্ধ ধর্মের সমার্থক নয় এমনকি তার প্রতিফলনও নয়। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীই প্রথম সার্থকভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে ধম্মনীতির প্রাথমিক শর্ত সুনীতিবাচক সামাজিক আচরণ। এই সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে জীবজগৎকেও অনুভুক্ত করে নিয়েছে। এই ব্যাখ্যারই আরও পরিণত রূপ দেন রোমিলা থাপার। তাঁর মতে সমগ্র সমাজের পটভূমিতে ব্যক্তির নীতিসম্মত আচরণের আদর্শ ধম্মনীতিতে উচ্চারিত। ধম্মনীতির পরিসর এতটাই বিস্তৃত ছিল যে তার আদর্শগুলি কোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর কাছেই আপত্তিকর হয় না তা দেখা যায়। অশোকের ধম্ম নিয়ে বিভিন্ন সন্দেহ ও দ্বিমতের অবকাশ থাকলেও তাঁর ধর্মীয় কর্তৃত্ব কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। তিনিই প্রথম ভারত ও তার বাইরে শ্রীলঙ্কা, গ্রিক, সিরিয়া, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন এবং ভারতবাসীর মনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত করতে সফল হন। তাই সেই সময় ভারতবর্ষে ও তার বাইরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে অশোকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। যদিও তাঁর এই ধম্মনীতিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বলেছেন। কিন্তু যদি ধম্মনীতিকেই সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করা হয় তাহলে অশোকের সময়ে তার কেন পতন ঘটল না বরং অশোকের মৃত্যুর ৫০ বছর পর সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। যদিও অশোক রাজনৈতিক কূটনীতির দ্বারা ধর্মের প্রচার করেন তাঁর সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য, তাহলে তাঁর কূটনীতি প্রশংসাযোগ্য কারণ তারপরে কোনো সম্রাট ছিলেন না যিনি এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এবং অশোক যুদ্ধ ত্যাগ করলেও তিনি মৌর্য বংশের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন কারণ তাঁর শাসনকালে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক কোনো দিকেই ফাঁক দেখা যায়নি। তিনি প্রতিটি ধর্মকে সমান শ্রদ্ধার নজরে দেখতেন।

সারনাথ

গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক

দেবারতি চক্রবর্তী
তৃতীয় সেমিস্টার (সাম্মানিক)

শশাঙ্ক ছিলেন গৌড় সাম্রাজ্য নামে বাংলা অঞ্চলে একীভূত রাষ্ট্রের প্রথম স্বাধীন রাজা, যিনি মোটামুটিভাবে ৫৯০ থেকে ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন বলে মনে করা হয়। শশাঙ্কের আসল নাম নরেন্দ্রদিত্য বা নরেন্দ্র গুপ্ত। শশাঙ্ক তাঁর উপাধি। সিংহাসনে তিনি এই নাম নিয়ে আরোহণ করেন। যদিও বির্তক আছে তবুও মনে করা হয় শশাঙ্ক ছিলেন রাজা কর্ণদেবের পুত্র, যিনি 'কর্ণসুবর্ণ' শহরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শশাঙ্ক শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ থেকে যার অর্থ চাঁদ। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন তিনি প্রবল শিবভক্ত ছিলেন। যেহেতু শিবের মাথায় চাঁদ থাকে তাই তাঁকে চন্দ্রশেখর বলা হয়, তাই রাজা তিনিও শশাঙ্ক, শশাঙ্কশেখর থেকে শশাঙ্ক উপাধি নিয়েছেন। তবে এতে কোনো দ্বিমত থাকে না যে তিনি একজন ব্রাহ্মণ শৈব উপাসক ছিলেন।

শশাঙ্কের পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা সেভাবে কিছু জানতে পারি না, তবে বানভট্টের 'হর্ষচরিত' সহ সমসাময়িক সাহিত্য উপকরণ, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ, রোহতাসগড়ে প্রাপ্ত সিলের ছাঁচে লিখিত 'শ্রী মহাসামন্ত শশাঙ্ক', ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' শশাঙ্কের ইতিহাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 'হর্ষচরিত' প্রণেতা বাণভট্ট শশাঙ্ককে 'গৌড়াধিপ', 'গৌড়' আবার কখনও 'গৌড়াধম' এবং 'গৌড়-ভুজঙ্গ' বলে অভিহিত করেছেন। ইউয়ান চোয়াং তাঁর গ্রন্থে শশাঙ্ককে 'কর্ণসুবর্ণের রাজা' বলে তার পরিচয় প্রদান করেছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, শশাঙ্ক ছিলেন রাজা কর্ণদেবের পুত্র, যিনি কর্ণসুবর্ণ শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। চিনা সন্ন্যাসী জুয়াংজাং-এর লেখায় শশাঙ্ককে 'শে-শাং-কিয়া' বল্লে উলেখ করা হয়েছে। তাঁকে 'শানকা গৌড়'ও বলা হয়, যা প্রাথমিকভাবে নির্দেশ করে যে তিনি গৌড়ের পরবর্তী বংশধর ছিলেন।

শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ

ইতিহাসবিদ ডি. কে. গাঙ্গুলির মতে শশাঙ্ক মগধের অধিবাসী ছিলেন। একই সূত্রে জানতে পারি যে ইতিহাসবিদ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য শশাঙ্ককে মহাসেনগুপ্তের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আবার ডি. ব্যানার্জি বলেছিলেন তিনি মুগ্ধ গুপ্তদের বংশধর। তবে জন মিডলটন সহ প্রমুখ ইতিহাসবিদরা উপযুক্ত প্রমাণের অভাব উল্লেখ করে এই মন্তব্যের বিরোধীতা করেছেন। ৪৬৭ খ্রিষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যে বেশ কয়েকজন দুর্বল রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার উপরে প্রায় ৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে আলচন হুন সেনারা পতনশীল এই গুপ্ত সাম্রাজ্যকে একাধিক দিক থেকে আক্রমণ করতে শুরু করে। বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যয় রাজকীয় কোষাগারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, যা গুপ্ত রাজাদের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। তবে উল্লেখ্য ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ শঙ্কর শর্মা যুক্তি দিয়েছেন যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একটি বিশাল বন্যার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। এই শতাব্দীর শেষের দিকে সাম্রাজ্যটি গুপ্ত রাজবংশের পরবর্তী এক দুর্বল শাসক মহাসেনগুপ্ত দ্বারা শাসিত হয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এর মধ্যে যশোধর্মনের মতো অসংখ্য স্থানীয় সামন্ত রাজা ও শাসকের উত্থান ঘটে এবং তারা সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন। শশাঙ্ক এই উচ্চাভিলাসী স্থানীয় শাসকদের মধ্যে একজন হিসাবে আবির্ভূত হন, যাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল গৌড় এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ দখল করা।

শশাঙ্কের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মগধ রাজ্যের রোহতাস নামক ছোট্ট এক শহর রোহতাসগড়ে সপ্তম শতকের পাহাড়ি দুর্গে। এই সীলমোহরে খোদাই করে লেখা আছে, 'মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব'। কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে শশাঙ্ক পরবর্তী গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজা মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত হিসেবে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর পর, শশাঙ্ক পরবর্তী গুপ্ত এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অভিজাতদেরকে এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন এবং কর্ণসুবর্ণে তাঁর রাজধানী দিয়ে নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্ক মৌখরিদের অধীনে একজন সামন্ত ছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর পর ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শশাঙ্ক গৌড় রাজ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি তাঁর বিজয় উদ্‌যাপনের জন্য স্বর্ণমুদ্রা জারি করেছিলেন এবং 'মহারাজাধিরাজ' বলে নিজেকে সম্বোধন করেন।

লিপিমালা এবং সাহিত্যিক সূত্রে শশাঙ্ক গৌড়ের শাসক হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল হল গৌড়। গৌড়ের সীমানা বঙ্গদেশ থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। শশাঙ্ক ভারতের বিভিন্ন অংশে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল মৌখরীদের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ থেকে মগধ মুক্ত করা। শশাঙ্ক তাঁর মিত্র মালবের রাজা দেবগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে মৌখরী রাজা গ্রহবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। গ্রহবর্মা, দেবগুপ্তের হাতে নিহত হন। সেন (১৯৭৭) দেখিয়েছেন যে, শশাঙ্ক ছাড়া আর কেউ মগধের মৌখরি শাসকদের পরাজিত করতে পারেনি।

এরপর তিনি মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ এবং বিহারে তাঁর রাজ্য সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করেন। শশাঙ্ক গৌড়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর রাজ্য বঙ্গ ও গৌড়ের চেয়েও অনেক বড় ছিল। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে বঙ্গ থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অধিকাংশ পণ্ডিত গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে রাজ্যবর্ধনের সাক্ষাতের বিষয়টি সত্য বলে ধরে নিলেও শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর অভিযোগ এড়িয়ে যান। হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করার পর থানেশ্বর-এর রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের ভগ্নিপতি গ্রহবর্মনকে মালবরাজ দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। এরপর রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে দেবগুপ্তকে সহজেই পরাজিত ও হত্যা করেন। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ছিলেন দেবগুপ্তের মিত্র। শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করে। তবে এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। হর্ষবর্ধনের দুটি লিপি থেকে জানা যায় যে শশাঙ্কের শিবিরের এক মল্লযুদ্ধে রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাম্রশাসনে শশাঙ্ককে পরমভট্টারক পরম মহেশ্বর 'মহারাজাধিরাজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। অনুমান করা হয় বাংলা, বিহারের অধিকাংশ এবং উড়িষ্যা নিয়ে শশাঙ্কের গৌড় রাজ্য গঠিত ছিল। হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে তাঁর পরম শত্রু বলে গণ্য করতেন। তবে শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের মধ্যে কোনো সম্মুখ সমর হয়েছিল কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায় না। 'হর্ষচরিত' থেকে জানা যায় যে, শশাঙ্কের দ্বারা রাজ্যবর্ধনের হত্যার কথা শোনামাত্র হর্ষবর্ধন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পৃথিবীকে গৌড় শূন্য না করতে পারেন তাহলে পতঙ্গ যেমন আগুনে প্রাণ দেয় তেমনি আগুনে তিনি তাঁর পাপী দেহকে আহুতি দেবেন। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে পরাজিত করেন এবং নিজের রাজ্যের বাইরে না যেতে আদেশ করেন। হর্ষবর্ধনের আক্রমণের অংশ ছিল কর্ণসুবর্ণ। শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের দিকে অগ্রসর হন এবং অবরোধ করেন, হর্ষবর্ধনের সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান এবং ফলস্বরূপ হর্ষবর্ধন গৌড় রাজ্যের দিক থেকে ব্যাপক ক্ষতি পান। গৌড় সেনাবাহিনীর অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর পূর্বসূরি প্রয়াত গুপ্ত সেনাবাহিনীর মতো শশাঙ্কের সেনাবাহিনীতে পদাতিক এবং অশ্বারোহী ইউনিট ছিল। কামরূপ রাজা ভাস্করবর্মণ গৌড় বাহিনীকে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীর ক্ষেত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্মনের হাতে চলে যায়। তবে হিউয়েন সাঙ যিনি শশাঙ্কের মৃত্যুর পরপরই ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বাংলায় ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি তাঁর বর্ণনায় কর্ণসুবর্ণের শাসকের নাম উল্লেখ করেননি।

শশাঙ্ক ছিলেন একজন 'যুদ্ধবাজ রাজা'র মতো। তাঁর অবিরাম আক্রমণ এবং বিজয়গুলি একজন রাজাকে তাঁর রাজ্য বৃদ্ধির অভিপ্রায়ের কথা বলে। সেন শশাঙ্ককে একজন 'সামরিক অভিযাত্রী' হিসেবে বর্ণনা করেছেন তবে যশোধর্মনের মতো নয়। কনৌজ-থানেশ্বর জোটের সম্মিলিত শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য তিনি মালভ রাজা দেবগুপ্তের সাথে বিশেষ করে রাজনৈতিক জোট গঠন করেছিলেন। রাজা হিসাবে শশাঙ্ক অনেক গুপ্ত যুগের ঐতিহ্য অব্যাহত রেখেছিলেন। যেমন - ব্রাহ্মণদের জমি দান করা যার প্রমাণ সেই যুগের তাম্রলিপ্ত থেকে পাওয়া যায়, শশাঙ্কের দেওয়া 'দিনার' নামক সোনা ও রূপোর মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি হিন্দু ধর্মের প্রচার করেছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদের তিনি যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছিলেন।

১২ শতকের একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে শৈব উপাসক শশাঙ্ক বাংলার বৌদ্ধস্তূপ ধ্বংস করেছিলেন এবং তিনি বৌদ্ধ ধর্মের নিপীড়ক ছিলেন। শশাঙ্ক বোধগয়ার মহাবোধি মন্দিরে যেখানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব পেয়েছিলেন সেই বোধি গাছটি কেটে ফেলেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। আর. সি. মজুমদার বলেছেন যে এই বিবরণটি বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ এটি কথিত নিপীড়নের ৫০০ বছর পরে লেখা হয়েছিল, এবং এই বইতে লিপিবদ্ধ বিবৃতিগুলিকে ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। তবে হিউয়েন সাঙের বিবরণে বলা আছে - শশাঙ্কের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার, শশাঙ্ক কর্তৃক বোধিবৃক্ষ ছেদন, বুদ্ধগয়ার বুদ্ধ মূর্তিটিকে নিকটবর্তী হিন্দু মন্দিরে এবং বোধগয়ার মন্দিরে শিবের মূর্তি স্থাপন, কুশীনগর ও বারানসীর মধ্যবর্তী স্থলে স্থাপিত বৌদ্ধ মঠটির ধ্বংস সাধন প্রভৃতি। পাটলিপুত্রে সংরক্ষিত বুদ্ধের পদচিহ্ন যুক্ত পাথরটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ ও ফলস্বরূপ নানারকম রোগভোগ ও মৃত্যুর কাহিনী 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'-এ পাওয়া যায়।

ইতিহাসবিদদের মতে এইসময় গৌড় রাজাদের দরবারে কবিতার বিকাশের সাথে সাথে অনন্য গৌড় রচনাশৈলীরও বিকাশ ঘটে। সিংহাসনে আরোহণ করার পরেই শশাঙ্ক 'বঙ্গাব্দ' বা বাংলা সন প্রবর্তন করেছিলেন। বাংলা ক্যালেন্ডারের উৎপত্তি শশাঙ্কের রাজত্বকালেই বলে জানা যায়। যা এখন বাংলা ও বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

শশাঙ্কের রাজত্বকালে পদ্মাসনা লক্ষ্মীর মূর্তি খোদাই করা কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রাতেও এই ধরনের লক্ষ্মীমূর্তি খোদাই করা দেখতে পাওয়া গেছে। তবে, নকল মুদ্রার কারণে আসল সোনার মুদ্রার মান হ্রাস পেয়েছিল।

রাজা শশাঙ্ক প্রবর্তিত তিনটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে দুটি তার অষ্টম এবং দশম রাজত্ব বছরে জারি করা হয়েছিল এবং এটি মেদিনীপুর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। অন্যটি 'এগ্রা তাম্রশাসন' নামে পরিচিত, খড়্গপুরের কাছে আবিষ্কৃত হয়েছিল তবে এর কোনো তারিখ নেই।

শশাঙ্কের মুদ্রা

বর্তমান মেদিনীপুরে অবস্থিত শরশঙ্কা হল এক বিশাল দিঘি যার আয়তন ১৪০ একরের বেশি। এর নান্দনিকতা হিন্দু বাস্তুশাস্ত্র স্কুলের স্থাপত্য, নকশা এবং নন্দনতত্ত্বের স্পষ্ট প্রভাব দেখায়। বাঙালি লোককথা ও কিংবদন্তি অনুসারে, রাজা শশাঙ্কের নির্দেশে এই দিঘিটি খনন করা হয়েছিল।

পরাক্রমশালী রাজা হর্ষের বিরুদ্ধে রাজা শশাঙ্কের একীভূতকরণ, এবং পরবর্তীকালে বঙ্গ, সমতট এবং গৌড় সহ স্থানীয়, বৈষম্যপূর্ণ রাজ্যগুলির প্রতিরক্ষা, বাংলার ধারণা এবং রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান হিসাবে বিবেচিত হয় । অনেক ঐতিহাসিকদের মতে শশাঙ্ক শুধু গৌড় নয়, বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা ছিলেন। গৌড় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেছেন যে, "সমগ্র গৌড় একসময় গৌড় দেশ নামে পরিচিত ছিল। কিছুদিন আগেও বাংলা ভাষা 'গৌড়ীয় ভাষা' নামে পরিচিত ছিল।"

বহু উপজাতি ও রাজ্যকে শশাঙ্ক এক পতাকার তলে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর এই কীর্তি তাঁর মৃত্যুর পরই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গৌড় রাজ্যের পতনের সাথে সাথে বাংলায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পাল শিলালিপিতে, এই সময়টিকে 'মৎস্যন্যায়ম' বলা হয়, যা 'জঙ্গল শাসনের' সময়কে বোঝায় যখন বড় মাছ ছোট মাছকে গ্রাস করে।

উপসংহারে বলা যায়, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে তিনিই প্রথম বাংলা ও বাঙালির প্রতি পুরো ভারতের সমীহ আদায় করেছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'শশাঙ্ক' বিখ্যাত ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এক ঐতিহাসিক উপন্যাস, যিনি মহেঞ্জোদারোতে তাঁর আবিষ্কারের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত তিনি শশাঙ্ককে বাংলার গৌরবময় অতীত এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আকাঙ্খার একটি শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে দেখতে পান।

Maa Saraswati in Sri Vidya
Medium: Pen on paper.
Artist: Sukalpa Chakraborty
Semester I (Honours)

দ্বারকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

স প্ত প র্ণী দে
প্রথম সেমিস্টার (সাম্মানিক)

ভ্রমণ মানুষের জীবনের নেশা বা পেশা দুটোই বলতে পারেন। ভ্রমণপিপাসুদের কাছে নতুন নতুন স্থান ঘুরে দেখাটা একটা আনন্দ। তেমনি আমিও হলাম একজন ভ্রমণপিপাসু। ভারতবর্ষের নানা স্থান আমার দেখা কিন্তু গুজরাট আমার কাছে অচেনা। এই স্থানকে দু'চোখ ভরে দেখার জন্য তাই রওনা দিলাম গুজরাটের উদ্দেশ্যে। এটি একটি ঐতিহ্যময় রাজ্য এবং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অসাধারণ। গুজরাট ভ্রমণের কথা বললেই যে জায়গার কথা মাথায় আসে তা হল দ্বারকা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বারকা নগরী আজ থেকে প্রায় নয় হাজার বছরের চেয়েও পুরোনো। এই নগর নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে চারধাম-এর মধ্যে অনন্য এক ধাম হলো গুজরাট। আবার ভারতের 'সপ্তপুরী' নামে পরিচিত সাতটি প্রাচীনতম শহরের অন্যতম হলো দ্বারকা। এটিই ছিল গুজরাটের প্রথম রাজধানী। সব তথ্য জানাশোনার পর বেরিয়ে পড়লাম এখানকার নানা মন্দির ও ঐতিহ্যময় জায়গাগুলোকে দর্শন করার জন্য। আমার ভ্রমণকৃত স্থানগুলি হল -

দ্বারকাধীস মন্দির

মন্দিরটি ২০০০ বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল। পাঁচতলা বিশিষ্ট এই মন্দিরটি চুনাপাথর ও বালি দিয়ে তৈরি। এই মন্দিরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২ দশমিক ১৯ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। একটি অন্তঃকক্ষ নিয়ে গঠিত। কক্ষের ভিতরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুজো করা হয়। সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ এবং বিকেলে ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে এই মন্দির। মন্দিরের কারুকার্য অসাধারণ।

রুক্মিণী মন্দির

দ্বারকা থেকে দু'কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই মন্দির ২৫০০ বছরের পুরোনো বলে মনে করা হয়। মন্দিরের কাঠামো উনিশ শতাব্দীর অন্তর্গত বলে অনুমান করা হয়। এই মন্দিরটিতে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় স্ত্রী রুক্মিণী দেবী। মন্দিরটি 'জল নিবেদন' প্রথার জন্য পরিচিত। আগত ভক্তদের মন্দিরে জল দান করতে হয়। মাতা রুক্মিণী এখানে নারায়ণের মতো বিরাজমান। শঙ্খ, চক্র, গদা,পদ্মধারী মা রুক্মিণী।

ভোদেশ্বর মহাদেবের মন্দির

প্রায় ৫ হাজার বছর আগে আরব সাগরের তীরে একটি শিবলিঙ্গ প্রকাশিত হয়েছিল যা এখানে ভোদেশ্বর মহাদেবের মন্দির নামে খ্যাত। আশ্চর্যের ব্যাপার হল সমুদ্রের জলে নিজে নিজেই অভিষেক হয় এই শিবলিঙ্গের।

নাগেশ্বর মহাদেব

নাগেশ্বর মহাদেব হল একটি জ্যোতির্লিঙ্গ। মন্দিরের ওপর রয়েছে বিরাট শিবমূর্তি যার উচ্চতা ৮২ ফুট। এই মন্দিরটি বানিয়েছিলেন রামের পুত্র কুশ।

শিবরাজপুর বিচ

শিবরাজপুর বিচ দ্বারকা থেকে ১৩ কিমি দূরে অবস্থিত। এই বিচে সমুদ্রের জল ঘন নীল। এই বিচে নানান ওয়াটার গেমস করা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো স্কুবা ডাইভিং। এই স্কুবা ডাইভিং-এর মাধ্যমে আমরা সমুদ্রের তলার দ্বারকা নগরীর দর্শন পাই।

গোপী তালাব

গোপী তালাব দ্বারকার পিছনে অবস্থিত একটি জলাশয়। কিংবদন্তি রয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে গোপীরা বৃন্দাবনে রাসলীলা করতেন। তিনি দ্বারকা আসার পর গোপীরা সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এই জলাশয়ে আত্মহত্যা করে।

সুদামা সেতু

সুদামা সেতু হল দ্বারকার অন্যতম একটি আকর্ষণীয় সেতু। এই সেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সুদামার মিলনস্থান।

দ্বারকা ভ্রমণের পর জানলাম নানান ঐতিহাসিক ঘটনা ও দেখলাম নানান ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক পুণ্যস্থান। ভারতের নানা জায়গায় ভ্রমণের পর দ্বারকা ভ্রমণ করে যেন আমার জীবন সার্থক হয়ে গেল।

শহরের মধ্যেই নিষিদ্ধ শহর, ফোর্ট উইলিয়াম

সু ক ন্যা দা স
তৃতীয় সেমিস্টার (সাধারণ)

প্রায় ২৫০ বছরের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণরূপে জীবন্ত, হাজার হাজার সেনার বাস সঙ্গে তাদের বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, বজ্র আঁটুনিতে ঘেরা সেই শহর খাস কলকাতার প্রাণকেন্দ্রেই অবস্থিত। নিরাপত্তার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তা বাইরের লোকের কাছে নিষিদ্ধ।

পুরোনো ফোর্ট উইলিয়াম, যা ১৭৫৬ সালে সিরাজের কলকাতা আক্রমণ-কালে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল। (ছবিঃ ইন্টারনেট সূত্রে পাওয়া।)

ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের (১৬৮৯-১৭০২) নামাঙ্কনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পত্তন ঘটে (১৬৯৬-১৭০২ সালে) বর্তমান বিবাদী বাগ চত্বর জুড়ে। তৎকালীন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই দুর্গ নির্মাণে অনুমতি দিলেও তৎকালীন বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ এবিষয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৭৫৬ সালে সিরাজ-উদ-দৌল্লা ক্ষমতায় এলে কলকাতায় ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় প্রদান, নবাবের সভাসদ-দেরকে নবাবের বিরুদ্ধাচার করার মদত দেওয়া ইত্যাদি তাঁর রাজ্যে বসে তাঁর বিরুদ্ধেই চলা চক্রান্ত মোটেই সহ্য করেননি। ফলস্বরূপ, ১৭৫৬ সালে সিরাজের নেতৃত্বে কলকাতা আক্রমণকালে এই দুর্গ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ সৌন্দর্যের দিক থেকে দুর্গটি অপরূপ হলেও সেটি ছিল যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ।

কিন্তু তার পরের বছর ১৭৫৭ সালে, ইতিহাস ঘুরে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে সিরাজ-উদ-দৌল্লা প্রথমে পরাজিত এবং পরে নিহত হন। এইসময় মীরজাফর নবাব হলেও তা নামমাত্র, ক্ষমতার রাশ থাকে ব্রিটিশদের হাতেই। ইংরেজদের বণিক সুলভ ভিক্ষাবৃত্তির দিন তখন নেই। তাই কালবিলম্ব না করে, ঠিক তার পরের বছর ১৭৫৮ সালে নতুন উদ্যমে নতুন দুর্গ গড়ার কাজ শুরু হয়। তবে এবারে আর পুরোনো জায়গায় নয়, সেখান থেকে অনেকটা দক্ষিণে তৎকালীন গোবিন্দপুর গ্রামে হুগলি নদীর এক বাঁকে, বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে শুরু হয় অত্যন্ত দুর্ভেদ্য একটি দুর্গের স্থাপনা। ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে এই দুর্গের নামও ফোর্ট উইলিয়াম রাখা হয়, তবে দুর্গের নকশা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেল। প্রথমে ক্যাপ্টেন জন ব্রহিয়ার-এর পরিকল্পনায় ও পরে সামরিক ইঞ্জিনিয়ার আর্কিবল্ড ক্যাম্পবেল-এর তত্ত্বাবধানে দুর্গটিকে দুর্ভেদ্য করে তোলার জন্য এটিকে তৈরি করা হল অষ্টভূজাকৃতি তারা বা স্টার-এর আদলে। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর হাত ধরে তৎকালীন কলকাতা প্রেসিডেন্সির ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

এই দুর্গের ছয়টি গেট, যার মধ্যে তিনটি গেট রয়েছে নদীমুখী (ওয়াটার গেট, জর্জেস গেট, ট্রেজারী গেট) এবং বাকী তিনটি গেট শহরমুখী (চৌরঙ্গী গেট, পলাশী গেট, ক্যালকাটা গেট)। শত্রু আক্রমণের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য দুর্গের ভিতর প্রায় ৩০ ফুট গভীর পরিখা কাটা হয় যা হুগলি নদীর দ্বারা সংযুক্ত। এই জলাশয় পারাপার করতে একটি পল্টন সেতু আছে যেটা শত্রু আক্রমণকালে খুলে নেওয়া যাবে, যাতে মূল দুর্গের থেকে বাইরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায়। একসময় ওই জলাশয়ে জল থাকত এবং তাতে কুমিরও ছাড়া থাকত। এরপরে আসে দুর্গের প্রকান্ড ঢাল, যেখানে প্রচুর কামান বসানো এই ঢাল বেয়ে ওঠা অসম্ভব। দুর্গের মূল ফটকের বাইরে আশেপাশের সমস্ত জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হয়েছিল যাতে দুর্গের ভিতর থেকে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি রাখা যেতে পারে। দুর্গের বাইরের সেই দিগন্তবিস্তৃত এলাকাই হল আজকের ময়দান বা 'কলকাতার ফুসফুস'। এই দুর্গম দুর্গ জয় করা তো দূরের কথা আজ পর্যন্ত এখানে কেউ আক্রমণ করারও সাহস পায়নি।

প্রায় আড়াইশো বছরের পুরোনো এই রোমহর্ষক, প্রকৌশলী ফোর্ট উইলিয়াম ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুর্গ অথচ এখনও পুরোমাত্রায় সচল। ১৮৫৮ সালের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে এই দুর্গ হস্তান্তরিত হয় এবং ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে আছে। পূর্ব ভারতের সমস্ত সামরিক কার্যকলাপ (পূর্বাঞ্চল সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তর) এখান থেকেই পরিচালিত হয়।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

কলকাতার বুকে বিশাল জায়গা জুড়ে অবস্থিত সাদা রঙের ভবনগুলি যার পদে পদে মিশে আছে নানা শৌর্যের ইতিহাস, যা কয়েক যুগ পরেও সেই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কিন্তু এতো বছরেও এই দুর্গটি কোনো প্রতিকূল অবস্থার মুখে পড়েনি, এমনকি দুর্গের থেকে কোনো গুলি ছোঁড়ারও প্রয়োজন হয়নি। তবে বিভিন্ন কারণে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিজয়ে একটি 'বিজয় স্মারক' এখানে নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি একটি বৃহত্তম সামরিক আত্মসমর্পণ, যা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্ভ্রম গোটা বিশ্বের সামনে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই অসাধারণ কীর্তিকে স্মরণ করেই ভারতের তিনটি সৈন্যদলের (স্থলসেনা, বায়ুসেনা, নৌসেনা) তিনটি বিজয় স্তম্ভ। এই স্তম্ভ তিনটি ধরে আছে ইস্টার্ন কমান্ডের পরিচয় জ্ঞাপক বোর্ড। বিজয় স্তম্ভের ঠিক নীচেই রয়েছে 'অক্ষয় জোতি' যা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্যাগ, শৌর্য ও দেশপ্রেমের প্রতীক এবং এই অগ্নিশিখা স্থায়ী ও জ্বলন্ত, এর অর্থ হল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সবসময় কর্মরত। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের প্রায় ৯৩,০০০ জন সেনা সহ লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এই সময় নিয়াজীর নিজহস্তে লিখিত চুক্তিপত্রটি এবং অরোরা ও নিয়াজীর সেটিতে স্বাক্ষর করার ছবিও এখানে সযত্নে রাখা আছে। এছাড়াও আছে যুদ্ধে ব্যবহৃত একটি ট্যাঙ্ক, যার ব্যারেল নীচের দিকে নামানো। কারণ এটি পরাজিত পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক, একটি মিগ-২১ যুদ্ধবিমান, আইএনএস বিক্রান্ত নামক যুদ্ধ জাহাজের একটি প্রতিরূপ। মুক্তিযুদ্ধের সময় সকল ভারতীয় শহীদ এবং অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের নামও রেজিমেন্ট সহ খোদাই করা আছে।

এখানে ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধ এবং ১৯৬৭ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের শহীদ সেনা এবং অংশগ্রহণকারী সেনাদের নাম ও রেজিমেন্ট খোদাই করা আছে।

দুর্গের ভিতর আছে ৬০০-র বেশী কামান, কোনওটা নবাবের আবার কোনওটা ব্রিটিশদের (ব্রিটিশদের কামানে সিংহের চিহ্ন পাওয়া যায়)।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে ডালহৌসি ব্যারাকে একতলার একটি সেলে নেতাজী বন্দি ছিলেন। সেখানে বন্দিদের খাবার দেওয়ার পদ্ধতির প্রতিবাদে তিনি অনশন শুরু করলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তিনদিনের মাথায় তাঁকে এলগিন রোডের বাড়িতে স্থানান্তর করে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। ঠিক তার পরের মাসে এই বাড়ি থেকেই তাঁর মহানিষ্ক্রমণ ঘটে।

লক্ষ্ণৌ-এর শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ আমহার্স্ট হাউসে বন্দী ছিলেন। তাঁর মাসোহারা ছিল প্রায় দু' লক্ষ টাকা। তাতেও তাঁর ঠিকমতো চলত না।

জেমস প্রিন্সেপ যার নামকরণে প্রিন্সেপ ঘাট, তিনি দ্বাররক্ষী নির্মাণ করিয়েছিলেন। যারমধ্যে একটি সিংহ ঘুমোচ্ছে এবং অন্য সিংহটি জেগে রয়েছে, এর অর্থ হল ২৪×৭ কেউ না কেউ জেগে রয়েছে এবং দুর্গটি পাহারা দিচ্ছে। এই দ্বাররক্ষী আগে প্রিন্সেপ ঘাটে থাকলেও বর্তমানে তা ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর রাখা আছে।

এছাড়াও আছে চারতলা সমান কিচেনার হাউস, যা প্রাসাদ সমতুল্য, এটি ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার ইন চীফদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই প্রাসাদেই লর্ড ওয়েলেসলি ১৪ বছর কাটিয়েছিলেন (১৭৮৯-১৮০৩)।

ফোর্ট উইলিয়ামের বল টাওয়ার এবং টাইম গান ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বল টাওয়ারের বলটি একটি মাস্তুলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, প্রতিদিন দুপুর ১২:৫৫ মিনিটে বলটি সংযুক্ত মাস্তুলে অর্ধ মাস্তুলে উঠত এবং ১২:৫৮ মিনিটে বলটি মাস্তুলের শীর্ষে উঠত। আবার দুপুর ১টা বাজলে বলটি নীচের দিকে নামতে থাকত। এর মাধ্যমে কলকাতা বন্দরের জাহাজগুলি সিগন্যাল পেত। সময় এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নতি হল, এই বল টাওয়ারের বদলে এল টাইম গান। এক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে দুপুর ১টা বাজলে দুর্গের মাথায় থাকা একটি কামান থেকে গুলি বের হতো এবং এই সময় হাওড়া ব্রিজ খুলে যেত (তখন হাওড়া ব্রিজ পল্টন ব্রিজ ছিল)। এটি যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি আহ্নিক গতিরও নির্দেশনা দিত।

এখানে বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র (এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়া জিনিস) আছে। বিভিন্ন রাজার সময়কালের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির তরবারি আছে। এছাড়াও আছে কমান্ড মিউজিয়াম, গথিক স্ট্রাকচারে নির্মিত সেন্ট পিটার্স চার্চ (বর্তমানে এটি কমান্ড লাইব্রেরী), কামানের গোলা এবং কেল্লার অস্ত্রাগার থেকে সেই গোলা ওপরে বসানো কামান পর্যন্ত পৌঁছনোর সুবন্দোবস্ত। প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বর এখানে বাংলাদেশের 'বিজয় দিবস' উদ্‌যাপনে বিশেষ সামরিক অনুষ্ঠান হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ দুর্গের অন্দরমহল এবং ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সঙ্গে বর্তমান ভারতের সাধারণ নাগরিকদের পরিচয় করানোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু জায়গা (উপরের লেখায় যে জায়গাগুলির উলেখ আছে) উন্মুক্ত করেছেন। এর জন্য অবশ্যই প্রশাসনিক অনুমতির প্রয়োজন, ওঁনাদের ই-মেল আইডিতে যোগাযোগ করলেই অনুমতি পাওয়া যাবে। এই অভিযানের পোশাকি নাম 'ফোর্ট উইলিয়াম হেরিটেজ ওয়াক'। মোবাইল ফোন, ক্যামেরা ফটোগ্রাফি, ভিডিও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কঠিন সামরিক নিয়মের বেড়াজাল ছিন্ন করে সেনাকর্তাদের আতিথেয়তা, আন্তরিকতা, আত্মীয়তার মেলবন্ধন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ফোর্ট উইলিয়াম বর্তমানে কলকাতার একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র, যা মূলত আট থেকে আশি প্রত্যেকের জন্যই শিক্ষামূলক ভ্রমণ।

নীলকুঠির নীল কড়াইঃ এক ইতিহাসের সাক্ষী

শুভম রায়
তৃতীয় সেমিস্টার (সাম্মানিক)

নদীয়া জেলার ছিটকার এক প্রাচীন বাড়ি, যেখানে ইতিহাস এখনও নীরব সাক্ষী হয়ে বিরাজমান। এখানকার এক সাধারণ ঘরের ভেতর সংরক্ষিত রয়েছে নীলচাষের একটি বিশাল কড়াই। এটি কেবলমাত্র একটি ধাতব পাত্র নয়; এটি ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মমতার নিদর্শন এবং সেই শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিরোধের এক নির্বাক স্মারক।

কড়াইয়ের বিবরণ

এই কড়াইটি বিশালাকার - প্রায় ১৮ ফুট লম্বা এবং ১৫ ফুট চওড়া। এককালে এটি ব্যবহৃত হতো নীল রঙ প্রস্তুত করার জন্য। চাষিদের রক্ত-ঘামে উৎপন্ন নীল গাছকে এই বিশাল পাত্রে সিদ্ধ করে রং তৈরি করা হতো। এটি বর্তমানে উল্টো করে রাখা রয়েছে এবং বাড়ির সদস্যরা এটিকে খাট হিসেবে ব্যবহার করেন। স্থান সংকুলান এবং সৃজনশীল ব্যবহারের এক অপূর্ব উদাহরণ এটি।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

নীলচাষ ছিল ব্রিটিশ শাসনের এক নিষ্ঠুর অধ্যায়। বাংলার উর্বর মাটিতে নীলগাছ চাষ করতে কৃষকদের বাধ্য করা হতো, যা তাদের জন্য ছিল নিদারুণ শোষণমূলক। নীল উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি ছিল শ্রমসাধ্য এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। নীলকুঠির এই বিশাল কড়াই ছিল সেই সময়কার নীল উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম।

নীল প্রস্তুতের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করার পর তা পাত্রে ফেলে উচ্চ তাপে সিদ্ধ করা হতো। এর ফলে যে নীল রঞ্জক বেরিয়ে আসত, তা ইউরোপে পাঠানো হতো। বাংলার কৃষকদের পায়ের নীচের মাটি যেমন নীলচাষের জন্য উর্বর হয়ে উঠেছিল, তেমনই তারা তাদের অধিকার এবং জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতে শুরু করেছিল। নীল বিদ্রোহ সেই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রথম ধাপ।

আজকের অবস্থান

ছিটকার এই বাড়িটিতে সংরক্ষিত কড়াইটি কালের সাক্ষী হয়ে আছে। বর্তমানে এটি আর তার পুরোনো কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় না। বরং এর ব্যবহারিক দিকটি বদলে গেছে। পরিবারের সদস্যরা এটিকে খাট হিসেবে ব্যবহার করছেন। হয়তো এটি তাদের কাছে একটি সাধারণ বস্তু, কিন্তু এটি প্রতিটি দর্শকের মনে জাগিয়ে তোলে ঔপনিবেশিক শোষণের স্মৃতি।

একটি মজার কাহিনী

বাড়ির ছোট সদস্যদের জন্য এই 'খাট' একটি রহস্যময় বস্তু। তারা জানে এটি স্রেফ লোহার তৈরি একটি খাট, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারা বুঝতে পারে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব। এক বৃদ্ধ সদস্য হেসে বললেন, "আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানতেন না, একদিন আমরা এই কড়াইতে শুয়ে ঘুমোবো!" এই মজার মন্তব্যের মধ্যেও লুকিয়ে আছে নীলচাষের অন্ধকার অধ্যায়ের গভীর স্মৃতি।

সংরক্ষণের গুরুত্ব

এমন জিনিস শুধু ঐতিহাসিক নিদর্শন নয়; এটি আমাদের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এটি তুলে ধরা জরুরি, যেন তারা বুঝতে পারে বাংলার ইতিহাস এবং সংগ্রামের গভীরতা। নীলকুঠির এই কড়াই, তার স্থান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেও আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয়। এটি আমাদের স্মরণ করায়, ইতিহাস কেবল বইয়ের পাতায় লেখা থাকে না, বরং স্থান, বস্তু এবং মানুষের মনের গভীরে সংরক্ষিত থাকে।

The Unknown Story of Sri Jagannath Temple

Sandeep Ghosh
Semester V (Honours)

Kalinga, Utkal as better known to all as Odisa, Puri is also a well known tourist spot in India, it not for only healthy but close to nature sea beach and Konark Sun Temple and Sri Jagannath Temple for historical interest. Today, our main focus on Sri Jagannath Temple.

A well known story honoured our mind, about Ashoka (Emperor). After Kalinga war Ashoka could not taken any weapons to stretch his dynasty and sponsored the doctrine of Buddha for peace. once noted historian H. G. Well's said, "It was the most exceptional example in the world history..."

From 1077 to 1147 the King Ananta Burman Chorganga who was descented of 'Ganga' and ruled seventy one years. He build most famous Sri Jagannath Temple which is a most favourite place for those wanderlust peoples.

Nowadays, the Hindus are claimed that the Sri Jagannath Temple is the place for theirselves, we know that emperor Ashoka was patronised Buddhism till his death, and Kanishka also patronised Buddhism. After the death of Ashoka, Gupta dynasty was patronised 'Hindu concept'. [Actually, Hinduism was well propaganded by Raja Ram Mohan Roy in the year 1816].

The beginning of the seventeenth century and the end of Aryavarta. Hindu emperor Sasanka mostly propaganded Hindu concept and he was also a devotee of Lord Shiva. According the version of Chinese traveller Hiuen Tsang, Sasanka was uprooted Buddha's stone footstep to the Ganga river. Remour spread that noted archaeologists Rakhaldas Bandhopadyay and Ramprasad Chandra were supressed this incident. But it is not our subject to discuss. Many waves were flowed through many obstacles, Buddhism was not ruined but it was survived his own way. That time Puri was not famous place for Hindus but Buddhists, and it was known as a sacred place for Buddhists. Not for Sri Jagannath, peoples were worshipped Buddha's 'holy teeth' with great respect and it was considered as a holy symbol for them. The particular date in a year, they were toured in the city with holy symbol through chariot and its called as 'Danta Yatra'.

Historians said, after the dull condition of Buddhism, Hindu concept peoples were the position but not in popularity. so, they made a plan and they were created 'Triratna' doctrine image which were the core believe of Buddhism.This images were combination as man but something different. It were the beginning of Jagannath, Balaram, Subhadra concept. If we are observed it carefully, the whole thing must be cleaned to ourselves. For this concept of this images Buddhists and Hindu concept peoples were march and popularized 'New concept of peoples' introduced three layers of Buddha. Firstly, Buddha could not believe in 'caste system' in Hindu concept people were lift up this system. Secondly, The New concept of peoples (majorly Hindus) were build those images which were not looking as a man but different because Buddha could not believed in 'Idolatry'. Although, after the death of Buddha his followers could not obeyed it properly. Thirdly, the new concept of peoples started 'Anna Bhakshan' (Eating rice) together with lower class peoples of our society. The noted historian Rajendralal Mitra explained this theory of his book, named 'Account of the Temple of Jagannath Lord of the World at Puri'.

Nowadays, the Jagannath chariot toured in same way in same month but the scenario is different. It has been changed through the time. if you are an interested tourist or a history lover, You have been discovered that, in the temple Buddhist images and little art crafts has been hide. If you just gave a fat bribe to Pandas, they'll help you to find those things. Presently, the previous theory could not implemented but the curse of caste politics surely destorted our history.

সম্পাদক অধ্যাপিকা বিভা ভট্টাচার্য, বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।